Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume –2, Issue-iii, published on July 2022, Page No. 231–240
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

সরলা দেবী চৌধুরাণী স্বাদেশিকতার এক মূর্ত প্রতীক : প্রসঙ্গ 'জীবনের ঝরাপাতা'

অরবিন্দ সরকার
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল : sarkararabinda54@gmail.com

Keyword
বন্দেমাতরম্, স্বাদেশিকতা, 'ভারতী' পত্রিকা, বীরাষ্টমী ব্রত, প্রতাপাদিত্য উৎসব, স্বদেশী স্টোরস্, স্বাধীনতা সংগ্রামী

Abstract
স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ের এক ব্যতিক্রমী নারী চরিত্র হলেন সরলা দেবী চৌধুরাণী। তিনি এমনই এক ব্যক্তিত্ব, যার দ্যুতি সে যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের, শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। দেশকে ভিতর থেকে গড়ে তোলার প্রয়াসে, রাষ্ট্রের বিভিন্ন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার আগ্রহে, নারী জাগরণে, রাষ্ট্রীয় সমস্যা ভাবনা নিয়ে লেখনি চালনায় তাঁর কোনো তুলনা নেই। স্বাধীনচেতা এই নারীর স্বভাব ছিল সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে একেবারে অন্য সুরে তৈরি। সমাজ ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন। তাঁর মানসিকতা যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর লেখা 'জীবনের ঝরাপাতা' গ্রন্থে। সংরূপ হিসাবে এই গ্রন্থ আত্মজীবনী কিন্তু এই গ্রন্থে বাঙালি তথা ভারতীয় নারীর সত্তা বিকাশের ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে ধরা পড়েছে। 'জীবনের ঝরাপাতা' তাই কেবল ব্যক্তিক কাহিনি নয়, একটি কালের কণ্ঠস্বরও বটে। তাই তাঁর 'জীবনের ঝরাপাতা'-র প্রতিটি পাতায় ঝরে পড়েছে স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা, স্বদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার অদম্য প্রচেষ্টা। বিভিন্ন কর্মের মধ্য দিয়ে তাঁর স্বদেশচেতনার পরিচয় পাই। সে চেতনা বাইরের কোনো আন্দোলনজনিত নয়, তার উৎস আত্মসচেতনতায়।

সরলাদেবী চৌধুরাণী জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি থেকে দেশাত্মবোধের তীর্থরেণু মাথায় করে যাত্রা শুরু করলেও, সেখানে পিতা জানকীনাথ ও তাঁর সহকর্মীদের প্রভাব বড় কম ছিল না। আর তারই ভিত্তিভূমিতে ক্রমেই বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ মনীষীদের নানা ভাবাদর্শজনিত স্নেহ সংস্পর্শে গড়ে উঠেছিল তাঁর সমগ্র জীবনের এক স্বকীয় মতবাদ। সরলাদেবী চৌধুরাণী ভারতীয়তার চেতনা থেকেই বুঝে নিয়েছিলেন উপনিবেশের স্বরূপ, অর্থনৈতিক শোষণ, বুঝেছিলেন আমরা যারা আরামে আয়াসে মানুষ তাদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা একটি ভাবের বিলাসমাত্র। তাই সেই স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করার জন্য প্রথম থেকেই তিনি উদ্যোগ নেন। সকলকেই স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের আগেই তিনি 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়েন। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে সংগ্রহ করে মেয়েদের জন্য স্বদেশী কাপড় বিক্রি করা হয়। বঙ্গভঙ্গ

আন্দোলনের বহু পূর্বেই তিনি, আশুতোষ চৌধুরী ও প্রমথ চৌধুরীর ভাই যোগেশ চৌধুরী এবং সমসাময়িক কিছু মানুষ মিলে 'স্বদেশী স্টোরস' গড়ে তোলেন। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল মানুষের মধ্যে স্বাদেশিকতাকে ছড়িয়ে দেওয়া। শুধু তাই নয়, বাঙালি হিসেবে বাঙালির দুর্বল অপবাদ ঘোচাতে যুবকদের অস্ত্র শিক্ষায় ব্রতী করে তোলেন। শুরু করেন প্রতাপাদিত্য উৎসব, উদয়াদিত্য উৎসব কিংবা বীরাষ্টমীর মতো অনুষ্ঠান। এমনকি তাঁর সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকাও শুধু সুকুমার সাহিত্যের রঙ্গভূমি ছিল না, বাহন হয়েছিল স্বাদেশিকতার। বাংলা সাহিত্যে নব দিগন্ত সূচনাকারী এই পত্রিকা তিনি এককভাবে সম্পাদনা করেছিলেন প্রায় ন'বছর (১৩০৬-১৩১৪ বঙ্গাব্দ)। এছাড়াও সমাজসংস্কারক পণ্ডিত রামভুজ দত্ত চৌধুরীর সহযোগিতায় 'হিন্দুস্থান' নামক একটি উর্দু সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন তিনি। এই সাপ্তাহিক ব্রিটিশ বিরোধিতার স্বাক্ষর ছিল। পরাধীন ভারতবর্ষে একটি সুপ্ত জাতিকে জাগ্রত করার জন্য, তার দীর্ঘ সুপ্তোবস্থা মোচনের জন্য, তার অন্তরে সাহস সঞ্চারের জন্য তিনি লিখেছিলেন নানা প্রবন্ধ। 'শতগান' নামক জাতীয় সংগীতের সংকলন, 'নববর্ষের স্বপ্ন', আত্মজীবনী 'জীবনের ঝরাপাতা' লিখে স্বদেশী আন্দোলন ও নারী স্বাধীনতার ইতিহাসে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। সাহস, বল, বিদ্যা, একতা, স্বাবলম্বন ও স্বায়ত্তশাসন— এই ছয়টি মার্গে নিযুক্ত থেকে দেশসেবা করেছেন এবং নারী মুক্তির পথ দেখিয়েছেন তিনি।

Discussion

সমগ্র দেশের বিশেষ একটি যুগসন্ধিক্ষণে সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন সরলাদেবী চৌধুরাণী। সারা ভারত জুড়ে তখন উচ্চারিত হচ্ছে নবজাগরণের মন্ত্র। সেই কর্ম মহাযজ্ঞে বাঙালি নিয়েছে পৌরোহিত্যের ভার। দেশের মুক্তির জন্য স্বদেশী আন্দোলন, বিভিন্ন বৈপ্লবিক সংগঠন, নারী জাগরণের কাজ চলেছে এগিয়ে। সভা-সমিতি, মিলনমেলায় এসেছে নতুন ভাবনার জোয়ার। সঙ্গীতে বাজছে দেশাত্মবোধের সুর। এই অবস্থায় প্রেরণার একটি উজ্জ্বল আলোক শিখার মতো দেশবাসীর কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন সরলাদেবী চৌধুরাণী।

কিন্তু সেই যে উজ্জ্বল শিখার মতো এসে দাঁড়ানো, বলাই বাহুল্য, তা কখনই হঠাৎ করে হয়নি। তার পিছনে ছিল সুদীর্ঘ এক মানসিক প্রস্তুতি। সেই উর্বর মানসক্ষেত্রে পলিমাটি এসে পড়েছিল যুগপৎ মাতৃকুল ও পিতৃকুলের প্রত্যক্ষ প্রেরণায়। তাঁর মা স্বর্ণকুমারী দেবীর ভাইদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পেয়েছিলেন মানস গঠনের মূল প্রেরণা। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি থেকে দেশাত্মবোধের তীর্থরেণু মাথায় করে যাত্রা শুরু করলেও, সেখানে পিতা জানকীনাথের ও তাঁর সহকর্মীদের প্রভাব বড় কম ছিল না। আর তারই ভিত্তিভূমিতে ক্রমেই বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, বালগঙ্গাধর তিলক, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, লালা লাজপৎ রায়, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ মনীষীদের নানা ভাবাদর্শজনিত স্নেহ সংস্পর্শে গড়ে উঠেছিল তাঁর সমগ্র জীবনের বিশিষ্ট এক স্বকীয় মতবাদ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯০৫ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় 'রমণীর স্বদেশব্রত' প্রবন্ধে তাঁর মা স্বর্ণকুমারী দেবী লেখেন-

> "দেশের মঙ্গলের জন্য পুরুষেরা যে দিকে অগ্রসর হইয়াছে আমাদেরও সেই দিকে অগ্রসর হওয়া উচিত।"[১]

সরলা দেবী হয়তো মনে প্রাণে মায়ের কথা শোনেন এবং সেই পথেই এগিয়ে যান।

সরলাদেবী চৌধুরাণী বেথুন স্কুলে পড়তেন। স্কুল জীবন থেকেই তাঁর মধ্যে স্বদেশ-প্রীতির পরিচয় আমরা পাই। ছাত্রীবস্থায় স্বদেশের প্রতি অগাধ ভালোবাসার একটা নমুনা আমরা তুলে ধরতে পারি তাঁর নিজস্ব জবানীতে–

> "বেথুন স্কুলের আবহাওয়ায় আমি ছিলুম ভারি স্বদেশপ্রেমিক। নতুন মামা একদিন আমাদের কোন একটা সার্কাসে নিয়ে যেতে চাইলেন– একটা বাঙালীর ও একটা উইলসন সাহেবের– যেটায় আমাদের অভিরুচি। আমি বললুম– 'বাঙালীর সার্কাসে যাব।' টাটকা বিলেত প্রত্যাগত মেজমামীর ছেলেমেয়েরা বললেন, সাহেবের সার্কাসে যাবেন, কেননা বাঙালীর সার্কাস নোংরা। আমি বললুম– 'হলই বা একটু নোংরা। কত কষ্ট করে বাঙালীরা নিজেদের একটা কিছু গড়ে তুলেছে– তাদের দেখব না?' নতুন মামাও স্বদেশী। তাই সেবারটা বাঙালী সার্কাসেই যাওয়া হল।"[২]

এছাড়াও স্কুলে উপর ক্লাসের কতকগুলি মেয়ের প্রভাবে তাঁর জাতীয়তার ভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ইলবার্ট বিলের আন্দোলনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন জেলে যান তখন কিছু না বুঝলেও সকলের মতো তিনিও একটি কালোরঙের ফিতে আস্তিনে বেঁধেছিলেন।

সরলাদেবী চৌধুরাণী ছিলেন একজন সুদক্ষ সঙ্গীত শিল্পী। তাঁর সঙ্গীতেও ধ্বনিত হয়েছে স্বাদেশিকতার সুর। জাতীয় সঙ্গীতের উদগাতা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি এক সময় গোটা দেশকে স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ করেছিল, তার মূলেও সরলা দেবীর অবদান একেবারে কম ছিল না। অনেকদিন পর্যন্ত আমরা জানতাম যে, 'বন্দেমাতরম' গানটির সুর দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিন্তু সরলা দেবীর আত্মজীবনী থেকে আমরা জানতে পারি শুধুমাত্র প্রথম দুটি পদের সুর দিয়েছেন তাঁর মামা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আর তাঁর আদেশেই বাকি পদগুলির অর্থাৎ 'ত্রিংশকোটিকণ্ঠ কলকলনিনাদ করালে' থেকে শেষ পর্যন্ত কথাগুলির সুর দিয়েছেন সরলা দেবী। তাই তিনি বলেছেন –

> "সে গান বঙ্কিম-ভক্তিতে ডোবা আমার প্রাণে প্রথম ফোটেনি। তার ফোটানতে ছিল রবীন্দ্রের হাত।"[৩]

তাঁর সুমধুর সুরে 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতটি হয়ে উঠেছে জাতীয়তাবোধের অন্যতম হাতিয়ার। দুই একটি জাতীয় উৎসবে সমস্বরে বহুজনকে বহুকণ্ঠে গাইতেও শিখিয়েছেন তিনি। তার পর থেকে সভা-সমিতিতে সমস্ত গানটাই গাওয়া হতে থাকে। সে স্মৃতি প্রসঙ্গে তিনি এক স্থানে উল্লেখ করেছেন–

> " 'বন্দেমাতরম' শব্দটি মন্ত্র হল সব প্রথম যখন মৈমনসিংহের সুহৃদ সমিতি আমাকে স্টেশন থেকে তাদের সভায় প্রোসেশন করে নিয়ে যাবার সময় ঐ শব্দ দুটি হুংকার করে করে যেতে থাকল। সেই থেকে সারা বাঙলায় এবং ক্রমে ক্রমে সারা ভারতবর্ষে ঐ মন্ত্রটি ছড়িয়ে পড়ল বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে যখন গবর্নর সাহেবের অত্যাচার আরম্ভ হল আহিমালয়কুমারিকা পর্যন্ত ঐ বোলটি ধরে নিলে।"[৪]

সরলা দেবীর গাওয়ার পর থেকেই 'বন্দেমাতরম' ক্রমে ক্রমে ভারতে সর্বত্র মেয়েদের কণ্ঠে ধ্বনিত হতে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দিল্লি থেকে একজন বৃদ্ধ বড় ইংরেজ ব্যারিস্টার একবার লাহোরে আসেন একটি মকদ্দমার সূত্রে। তিনি সরলা দেবীর বাড়িতে চা-পান করতে এসে সেই সময় বাংলার অফিসারদের দ্বারা স্থানে স্থানে নিষিদ্ধ 'বন্দেমাতরম' গানটি শুনতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সরলা দেবী পিয়ানো সহযোগে গানটি পরিবেশন করেন। ভদ্রলোক সেটি শুনে বলেন–

> "By Jove! কথা বুঝি না বুঝি তোমার গাওয়া শুনে বুঝছি কি তুমুল আলোড়ন আনতে পারে মনে। ...আমি যদি Bengal Government হতুম তোমার স্ত্রীর বিরুদ্ধে Externment order জারি করতুম, যাতে আর কখনো বাঙলায় গিয়ে বাঙালীদের মাতিয়ে তুলতে না পারে।"[৫]

এছাড়াও আলমোড়া পাহাড়ের উপর বিবেকানন্দ আশ্রমের অধিনেত্রী মিসেস সেভিয়ার সরলা দেবীর কণ্ঠে এই গান শুনে বলেছিলেন–

> "আর কিছু না, শুধু যদি জাতীয় গান গেয়ে গেয়ে ফেরো তুমি ভারতের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে সমগ্র দেশকে মাতাতে পার।"[৬]

সরলা দেবী একটি চারণ দল গড়ে ঘুরে ঘুরে গেয়ে দেশবাসীকে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। উপরিউক্ত দুটি সংলাপ থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি, সারা ভারতে জাতীয়তাবোধ উদ্বুদ্ধ করতে, স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করতে, স্বদেশের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা বৃদ্ধিতে, জাতীয় সঙ্গীতরূপে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে সরলাদেবী চৌধুরাণীর সুরে নির্মিত 'বন্দেমাতরম'–এর অবদানের কথা।

সরলাদেবী চৌধুরাণী দীর্ঘদিন 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদনা করেন। 'ভারতী'-র সঙ্গে প্রায় এক যুগ ধরে তিনি যুক্ত ছিলেন। যদিও একবারে তা ঘটেনি। প্রথমবার দিদি হিরন্ময়ী দেবীর সাথে যুগ্মভাবে ১৩০২ থেকে ১৩০৪ সন পর্যন্ত তিনি ছিলেন সম্পাদক। পরে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার যথাক্রমে ১৩০৬-১৩১৪ সন এবং ১৩৩১-১৩৩৩ সনে তিনি একক রূপেই 'ভারতী'-র সম্পাদক ছিলেন।

পত্রিকা-সম্পাদকরূপে তাঁর কৃতিত্ব আজও আপামর জনতার কাছে অমলিন রয়েছে। তাঁর আত্মজীবনী থেকে আমরা জানি তিনিই প্রথম লেখকদের পারিশ্রমিক দানের রীতি প্রবর্তন করেন। তিনিই প্রথম বুঝেছিলেন, যে সব লেখকের সহযোগিতায় পত্রিকাটি গরিয়ান ও স্বত্বাধিকারী লাভবান হন, সেই লভ্যাংশের কিছু না কিছু লেখকেরা পাবে না কেন? তাই তিনি নিয়ম করে 'ভারতী'-র প্রত্যেক লেখককেই কিছু না কিছু উপহার দেন। বলা বাহুল্য, 'ভারতী'-র এই নিয়ম জারির ফলে প্রত্যেক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক, স্বত্বাধিকারীরাই লেখকদের লেখার জন্য পারিশ্রমিকের খাতা খুলতে বাধ্য হন। সম্পাদকরূপে তাঁর দ্বিতীয় কৃতিত্ব হল– 'Punctuality'- যথাসাময়িকতা। তখনকার দিনে সাময়িক পত্রিকা কখনই যথা সময়ে বেরতো না। দেখা যেত, বৈশাখের পত্রিকা আষাঢ়ে প্রকাশ হত, আবার আশ্বিনের পত্রিকা প্রকাশিত হত অগ্রহায়ণে। সরলা দেবী দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে এই সমস্যার সমাধান করেন। ফলে, বাংলা মাসের ১ তারিখেই 'ভারতী' গ্রাহকদের হস্তগত হয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে সাময়িক পত্রিকার পক্ষে একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত এবং অন্যান্য সাময়িক পত্রিকাকেও সে দৃষ্টান্ত অনেকটা অনুপ্রাণিত করেছে। সম্পাদকরূপে লেখক তৈরী করা ছিল তাঁর অন্যতম একটি কাজ। তৈরী লেখকের লেখা দিয়ে পত্রিকার পৃষ্ঠা ভরাননি তিনি। কোন কোন লেখা প্রথম দৃষ্টিতে ফেলে দেওয়ার উপযুক্ত হলেও, সেগুলোকে ফেলে না দিয়ে কাটা ছেঁড়া করে জীবন্ত করে তুলেছেন। আর এই রকম করে তাঁর হাতে সেকালে অনেক চলনসই সুলেখক গড়ে উঠেছে।

তাঁর সম্পাদনায় 'ভারতী' জাতীয়তার ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। এক অর্থে এটি তাঁর অক্ষয়কীর্তি। 'জীবনের ঝরাপাতা'-য় তিনি বলেছেন–

> "আমার হাতে ভারতী শুধু সুকুমার সাহিত্যের রঙ্গভূমি ছিল না, বাহন হয়েছিল জাতীয়তার.."[৭]

'ভারতী' তাঁর হাতে কেমন জ্বলন্ত জাতীয়তার বাহন হয়েছিল, তার জীবন্ত বিবরণ এই স্মৃতিকথায় বিধৃত হয়েছে। মহারাষ্ট্রীয় ও দাক্ষিণাত্যের লোকেদের সংস্পর্শে এসে তাঁর স্বদেশপ্রীতির পরিধি যে অনেক বেড়ে গিয়েছিল তার পরিচয় তাঁর নিজের জবানীতেই আমরা পাই–

> "বাঙলার বাইরে এক বছর থেকে মহারাষ্ট্রীয় ও দাক্ষিণাত্যের লোকেদের সংস্পর্শে এসে আমার স্বদেশপ্রীতির পরিধিটা অনেক বড় হয়ে গিয়েছিল। শঙ্করাচার্য যে ভারতবর্ষকে উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম এই চতুর্দিকে চারটি ধামের বা তীর্থক্ষেত্রের বন্ধনীতে ঐক্যডোরে বেঁধেছিলেন সেই ভারতবর্ষ আমার বুকে আধিপত্য স্থাপন করেছিল। সেই সমগ্র ভারতের উপলব্ধিময় হয়েছিলুম– বঙ্গ যার পূর্ব প্রান্ত। বাঙলাকে বাকী প্রান্তগুলির সঙ্গে সমান লাইনে মাথা খাড়া করে দাঁড় করাতে হবে বটে, কিন্তু বাকী প্রান্তগুলিকে ভুললে চলবে না।"[৮]

এই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে আমরা তাঁর সমগ্র দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের মধ্যে একটি সার্বিক ঐক্যসূত্র আবিষ্কারের চিন্তার পরিচয় পাই। আর সেই চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে 'ভারতী'-র পাতায়। যে কারণে দাক্ষিণাত্য থেকে ফিরে তাঁর আঙুলের প্রথম সঞ্চালনে 'ভারতী'-র সেই বীণা রুদ্রবীণা হয়ে বেজে উঠেছে। তাঁর কলমের মাধ্যমে সমগ্র বাঙালিকে জাগিয়ে তুলতে, দেশের জন্য দরকারে প্রাণ উৎসর্গ করার ডাক দিয়েছেন। জ্বালাময়ী প্রবন্ধের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করেছেন বাংলার তরুণ দলকে। যার পরিচয় দিতে গিয়ে তাঁর আত্মজীবনীর একস্থানে বলেছেন–

> "যে বাঙালী পৈতৃক প্রাণটি বাঁচিয়ে রাখতেই সদা তৎপর, বীণা তাদের ডেকে বললে– মৃত্যুকে যেচে বরণ করতে শেখ, অগত্যা তার কবলিত হয়ো না। তাকে স্পর্ধা কর, তার সম্মুখীন হও– খেলায় ধূলায়, আমোদে প্রমোদে, শিকারে বিহারে, বিজ্ঞানে সজ্ঞানে, প্লেগে জনসেবায়, আগুনে লোক-উদ্ধারে, জলেতে আত্মপ্রাণপণে পরপ্রাণ রক্ষায়। ভূগোল শেখ ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণে- মানচিত্রে অঙ্গুলি সঞ্চারণে নয়।"[৯]

সরলাদেবী চৌধুরাণীর প্রথম নজর পড়ে অন্যান্য প্রদেশের মানুষদের থেকে বাঙালির চেহারাগত দৌর্বল্যের প্রতি। সেই সঙ্গে তিনি বুঝতে পারেন যে শুধুমাত্র শরীরগত দৌর্বল্য হটালে হবে না, বাঙালির মন থেকে ভীরুতা অপসারিত করতে হবে। কেননা তিনি প্রত্যক্ষ করেন, পশ্চিম ও পাঞ্জাবের বড় বড় পালোয়ানেরাও সাহেবের ভয়ে

তটস্থ। অতএব এই সাদা চামড়ার ভয় সরাতে 'ভারতী'-র পাতায় তাঁর হাতে ঝরে পড়েছে 'বিলিতি ঘুষি বনাম দেশী কিল' নামক প্রবন্ধ। তারপরই দিয়েছেন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক। বলেছেন–

> "ভারতীর পৃষ্ঠায় আমন্ত্রণ করলুম রেলেতে ষ্টীমারে, পথে-ঘাটে, যেখানে সেখানে গোরা সৈনিক বা সিভিলিয়ানদের হাতে স্ত্রী, ভগ্নী, কন্যা বা নিজের অপমানে মুহ্যমান হয়ে আদালতে নালিশের আশ্রয় না নিয়ে– অপমানিত ক্ষুব্ধ মানী ব্যক্তি স্বহস্তে তখনি তখনি অপমানের প্রতিকার নিয়েছে– সেই সকল ইতিবৃত্তের ধারাবাহিক বর্ণনা পাঠাতে। তাঁরা পাঠালেন ও তাঁদের ইতিবৃত্ত ভারতীতে বেরতে থাকল।"[১০]

আর এভাবেই 'ভারতী'-র সূক্ষ্ম বীণায় তিনি ধ্বনিত করেছেন রুদ্র ঝংকার। পাঠকমণ্ডলীর মনে লুকানো আগুন ধুঁকিয়ে ধুঁকিয়ে জ্বলে উঠেছিল প্রবল তেজে। যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে জেগে উঠেছিল এক দৃঢ় প্রতিম প্রাণের স্পন্দন। সেই সূত্রের উল্লেখ করে বলেছেন–

> "যে সাহিত্যের আঙ্গিনা ছিল কোমল আস্তরণ পাতা কমলালয়া সরস্বতীর নিকুঞ্জ, তা হল শ্মশানবাসী রুদ্রের ভীম নর্তনভূমি, আর তার তালে তালে সকলের পা আপনিই পড়ছে– ইচ্ছে করুক আর না করুক। দলে দলে স্কুল কলেজের ছেলেরা আমার সঙ্গে দেখা করতে আরম্ভ করলে– বয়স্কেরাও পিছিয়ে রইলেন না– অনেকেই, যাঁরা পরে নামজাদা হয়েছিলেন। আমি তাঁদের থেকে বেছে বেছে একটি অন্তরঙ্গ দল গঠন করলুম। ভারতবর্ষের একখানি মানচিত্র তাদের সামনে রেখে সেটিকে প্রণাম করিয়ে শপথ করাতুম তনু মন ধন দিয়ে এই ভারতের সেবা করবে।"[১১]

অতএব আমরা বুঝতে পারি, দেশবাসীর মধ্যে স্বদেশপ্রেমের জাগরণে, তরুণ রক্তকে উজ্জীবিত করতে, সকলকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে, স্বাজাত্যবোধের প্রেরণারূপে সরলাদেবী চৌধুরাণী সম্পাদিত 'ভারতী' হয়ে উঠেছিল এক রুদ্রবীণা।

সরলাদেবী চৌধুরাণীর কর্মজীবনের কেন্দ্রে ছিল স্বদেশচেতনা। সে চেতনা বাইরের কোনো আন্দোলনজনিত নয়। তার উৎস তাঁর আত্মসচেতনায়। সচেতন নারী হিসাবে যেমন তিনি ঘরে-বাইরের বিভাজনকে অমান্য করেছেন, বাঙালি হিসাবে তেমনি বাঙালির দুর্বল অপবাদ ঘোচাতে যুবকদের অস্ত্র শিক্ষায় ব্রতী করে তুলেছেন। গড়ে তুলেছেন প্রতাপাদিত্য-উৎসব, উদয়াদিত্য-উৎসব কিংবা বীরাষ্টমীর মতো অনুষ্ঠান।

সরলাদেবী চৌধুরাণী বড় হয়ে দেখেন বাংলার ললাটে প্রধান কলঙ্ক হচ্ছে কাপুরুষতার এবং সেটি মুছতে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। তিনি বুঝতে পারেন হাতে অস্ত্র ধরলেই ভীরুতা যায় না। কিন্তু অস্ত্রচালনার বিদ্যা জানা থাকলে ভরসা থাকে আততায়ীর শরীরে ঠিক কোন জায়গাটি বাঁচিয়ে কোন জায়গায় মারলে সে মরবে না, শুধু ঘা খেয়ে হতবল হবে। সেই সঙ্গে তিনি এও বুঝতে পারেন হাতের সঙ্গে সঙ্গে মনেরও বলের প্রয়োজন। এরকম সংকল্প নিয়েই বাঙালি জাতিকে বলবীর্যে বলীয়ান করে গড়ে তোলার জন্যে তৎপর হন। বাঙালি ছেলেদের বলেন–

> "তোমরা সেই ভারতের সন্তান, যাদের ধমনীতে আজও তোমাদের পূর্বগত ভারতবালক অনিরুদ্ধের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। সে রক্ত কলঙ্কিত করো না, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিও না। যদি উদারভাবে বল, ক্ষমা করে এসেছ তাদের, তবে জেনো অক্ষমের ধর্ম নয় ক্ষমা। আগে ক্ষমা করবার অধিকারী হও, প্রবল হও, বলবত্তর হও, তবে তোমার চেয়ে যে হীনবল, তার প্রতি দয়া করো, তাকে ক্ষমা করো– তার আগে ক্ষমা করা ভীরুতার কাপুরুষতার নামান্তর।"[১২]

আর এর ফলস্বরূপ আমরা দেখি গোরাদের বিরুদ্ধে বাঙালিদের অভূতপূর্ব জয়। এই জয়ের খবরটা 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকায় প্রকাশ করে সম্পাদক লেখেন–

> "আমরা জানি এ ঘটনায় সবচেয়ে বেশি আনন্দিত যিনি হবেন তিনি হচ্ছেন সরলা দেবী বাঙলার একটি নন্দিনী।"[১৩]

সরলাদেবী চৌধুরাণী বাংলায় একটি জাতীয় উৎসবের দিন নির্দিষ্ট করার দিকে মনোনিবেশ করেন। মহরমের দিন দেখি মুসলমানদের নানারকম অস্ত্রচালনার প্রদর্শনী চলে পথে ঘাটে। তার জন্যে সারাবছর তারা তৈরি হয় কোনো না কোনো আখড়ায় নানা নেতার অধীনে। যেমন– রামলীলা ও দশেরা বা বিজয়দশমীর দিন বঙ্গেতর হিন্দু ভারতে বীরোচিত নানা খেলাধূলা চলে ঠিক তেমনই বাংলায় একটি জাতীয় উৎসবের দিন ঠিক করতে চান তিনি। কিন্তু সহজেই কোনো সিদ্ধান্তে তিনি আসতে পারেন না। এইরকম দ্বিধান্বিত অবস্থায় বাঙালির পঞ্জিকা তাঁর সহায় হয়। হঠাৎ একদিন দুর্গা পুজোর ছুটি কবে থেকে আরম্ভ হবে তা জানার জন্য পাঁজির পাতা উল্টাতে উল্টাতে তাঁর চোখে পড়ে দুর্গা পুজোর অষ্টমীর আর একটি নাম 'বীরাষ্টমী' এবং সেদিন 'বীরাষ্টমী ব্রত' পালন করা ও ব্রতকথা শোনানোর বিধান। কিন্তু তিনি প্রচলিত 'বীরাষ্টমী'-র পরিবর্তে আধুনিক বীরাষ্টমী উৎসবের সূচনা করেন। বীরাষ্টমীর প্রাচীন খোলস ছাড়িয়ে তাকে এক নবরূপ দান করেন। খড়গকে বেছে নেন তার অন্যতম উপায়রূপে। কারণ হিন্দুর পূজা তিন রকমের হয় ঘটে, পটে, ও খড়গে। বীরাষ্টমীর অন্তর্নিহিত বীরোচিত ভাবাদর্শের অনুসঙ্গ খড়গই হতে পারে, ঘট অথবা পট নয়। এইভাবে সাহসকে বিস্তৃত করতে, জাতীয় চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করতে 'বীরাষ্টমী' উৎসব প্রবর্তিত হয়।

সরলাদেবী চৌধুরাণী সেই বছরই মহাষ্টমীর দিন ২৬ নং বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের মাঠে ছেলেদের অস্ত্রবিদ্যা প্রদর্শনীর ঘোষণা করে সকলকেই এই উৎসবে যোগদান ও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ করেন। প্রতিযোগিতার শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়– কাউকে মুষ্টি যুদ্ধের জন্য দস্তানা, কাউকে ছোরা, কাউকে লাঠি। অবশেষে প্রতিটি খেলোয়াড়কে তিনি স্বয়ং একটি করে 'বীরাষ্টমী পদক' উপহার দেন। যে পদকের একপিঠে খোদিত থাকত 'বীরোভাব' এবং অন্যপিঠে 'দেবাঃ দুর্বলঘাতকাঃ'। বীরাষ্টমী উৎসব অনুষ্ঠানেরও একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমে একটি পুষ্পমালা শোভিত খড়গ বা তলোয়ারকে উৎসবের প্রতীকরূপে গণ্য করে তাকে ঘিরে মন্ত্রোচ্চারিত হত পুষ্পাঞ্জলি সহযোগে। মন্ত্রে চতুর্দশ বীরের শ্রীকৃষ্ণ থেকে আরম্ভ করে রাজা সীতারাম রায় পর্যন্ত নাম স্মরণ করে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার প্রথা ছিল। সে মন্ত্র বীর পুরুষের বন্দনাসূচক স্তোত্র বিশেষ। যেমন– তার একটি অংশ –

> "বীরাষ্টম্যাং মহাতিথৌ পূর্ব পূর্বগতান্ বীরান্
> নমস্কুর্য ভক্তিপূর্বং পুষ্পাঞ্জলিং দদাম্যহম্।।
> … … …
> এতৎ সর্বেষান্ পূর্বগতান্ পদে পুষ্পাঞ্জলিং দত্বা
> বীরাষ্টম্যাং নমস্কুর্ম বয়ম্ অদ্য নমোনমঃ।।"[১৪]

প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, উল্লিখিত বীরত্বব্যঞ্জক সম্পূর্ণ স্তোত্রটি খিদিরপুরের তৎকালীন খ্যাতনামা স্বদেশী আশুতোষ ঘোষ রচনা করে দিয়েছিলেন। এই ভাবেই বীরাষ্টমীর উৎসব বাংলায় প্রবর্তিত হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি, সেই সময় একবার বরোদার গায়কোয়ার ও তাঁর রানি দার্জিলিং থেকে সরলা দেবীর বাড়িতে আসেন। বরোদা রাজাকে তিনি দেওয়ালে টানানো কালীর ছবির দিকে ভালো করে দেখতে বললে তিনি সরলা দেবীর ছবির দিকে ফিরে হেসে বলেন-

> "কোন কালী দেখব? এই কালী না ঐ কালী?"[১৫]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে তিনিই প্রথম বাঙালির ধমনীতে বীররসাত্মক প্লাবন বইয়ে দিয়েছিলেন নতুন করে। 'বীরাষ্টমী' উৎসবের প্রবর্তনাই তাঁর একমাত্র কীর্তি ছিল না, সেক্ষেত্রে 'প্রতাপাদিত্য- উৎসব'ও উল্লেখযোগ্য। 'ডন' পত্রিকার সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভাগ্নে মণিলাল গাঙ্গুলী পরিচালিত সভার সভানেত্রীরূপে তিনি ১লা বৈশাখ 'প্রতাপাদিত্য উৎসব' প্রচলন করেন। এই দিনটিতেই প্রতাপাদিত্যের রাজ্যাভিষেক হয়েছিল। তাঁর এই প্রয়াসকে তদানীন্তন বাংলার একাধিক মনীষী ও বিভিন্ন পত্র পত্রিকা যেমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন, তেমনি কেউ কেউ ঠাট্টা বিদ্রুপও কম করেননি। যেমন 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকার সম্পাদক বিপিনচন্দ্র পাল টিপ্পনী কেটে লেখেন–

"As necessity is the mother of invention, Sarala Debi is the mother of Pratapaditya to meet the necessity of a hero for Bengal!"[১৬]

আবার 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়-

"মরি মরি কি দেখিলাম! এ কি সভা! বক্তিমে নয়, টেবিল চাপড়া-চাপড়ি নয়- শুধু বঙ্গবীরের স্মৃতি আবাহন, বঙ্গ-যুবকদের কঠিন হস্তে অস্ত্রধারণ ও তাদের নেত্রী এক বঙ্গললনা– ব্রাহ্মণ কুমারীর সুকোমল হস্তে পুরস্কার বিতরণ। দেবী দশভুজা কি আজ সশরীরে অবতীর্ণা হইলেন? ব্রাহ্মণের ঘরে কন্যা জাগিয়াছে, বঙ্গের গৌরবের দিন ফিরিয়াছে।"[১৭]

কিন্তু দেশের লোক এ টিপ্পনিতে ভয় পায়নি। বরং বাঙালির মর্মদেশে প্রতাপাদিত্যের প্রবেশ ঘটেছে। যার প্রথম বহির্বিকাশ দেখা দিয়েছে প্রোফেসর ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'প্রতাপাদিত্য' নাটক রচনায় ও স্টার থিয়েটারে রাতের পর রাত তার অভিনয় পরিচালনায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, সবচেয়ে বড় তীরটি তাঁর বুকে এসে বিঁধেছে রবীন্দ্রনাথের হাত থেকে দীনেশচন্দ্র সেনের মারফত। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁকে জানিয়েছেন যে, রবীন্দ্রনাথ 'বউ ঠাকুরাণীর হাট'-এ যে ভাবে প্রতাপাদিত্যকে চিত্রিত করেছেন, তার বিপরীতে সরলা দেবী প্রতাপাদিত্যকে প্রতিষ্ঠিত করায় তাঁর উপর ভীষণ চটে—গেছেন রবীন্দ্রনাথ। এর উত্তরে সরলা দেবী দীনেশচন্দ্র সেনকে বলেছেন–

"আপনি তাঁকে বলবেন, আমি ত প্রতাপাদিত্যকে Moral মানুষের আদর্শ বলে খাড়া করতে যাইনি- তাঁর পিতৃব্য-হনন প্রভৃতির সমর্থন করিনি। তিনি যে Politically Great ছিলেন, বাঙলার শিবাজী ছিলেন, মোগল-বাদশার বিরুদ্ধে একলা এক হিন্দু জমিদার খাড়া হয়ে বাঙলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন, নিজের নামের সিক্কা চালিয়েছিলেন– সেই পৌরুষ, সেই সাহসিকতার হিসেবে তিনি যে গৌরবার্হ, তাই প্রতিষ্ঠা করেছি। এতে যদি ইতিহাসগত কোন ভুল থাকে তিনি সংশোধন করে দিন, আমি মাথা পেতে স্বীকার করে নেব।"[১৮]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্বর্ণকুমারী দেবী ও তাঁর কন্যা সরলার প্রতিভার প্রতি রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই সুবিচার করেননি। স্বর্ণকুমারী দেবীর বিদায় গ্রহণের পর রবীন্দ্রনাথ যখন 'ভারতী' পত্রিকার দায়িত্বভার অস্বীকার করে (সম্পাদনা পর্ব ১৩০৫-১৩০৬ বঙ্গাব্দ) 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন'এর প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন, সরলা ও হিরন্ময়ী তখন অপ্রত্যাশিতভাবে আহত হন। এমনকি ১৯১৩ সালে 'কাহাকে'র অনুবাদ 'The unfinished song' যখন ইংল্যান্ডে প্রকাশিত হয়, সম্ভবত: সেসময়ই এই অনুবাদ ও অনুবাদিকা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ রোদেনস্টাইনকে লেখেন-

"She is one of those Unfortunate being who has more ambition than abilities. But just enough talent to keep her mediocrity alive for a short period. Her weakness has been taken advantage by some unscrouplous literary agents in London and he had stories translated and published."[১৯]

প্রতাপাদিত্য উৎসব করেই তিনি থেমে থাকেননি। এবার প্রতাপাদিত্যের পুত্র উদয়াদিত্যের উৎসবের আয়োজন করেন। উদয়াদিত্য উৎসবের ঘোষণায় 'বেঙ্গলি' পত্রিকা লেখে–

"সরলা দেবী দেশের উপর নতুন নতুন 'Surprise spring' করছেন– আমরা তাঁর সঙ্গে দৌড়ে দৌড়ে হাঁফিয়ে পড়ছি। রোজ ভোরে উঠে মনে হয় অতঃ কিম্?"[২০]

এই উদয়াদিত্য উৎসবের উদ্বোধনী সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি বিস্তার করে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ বলেন–

"আজকের এই ক্ষুদ্র উৎসবের পরিকল্পনারূপী মৎস্যটি একদিন সমগ্র বাঙালী জাতির মধ্যে কায়াবিস্তার করে বাঙালীকে বীরত্বে বিপুল করে পরিদৃশ্যমান হবে।"[২১]

তাঁর সে ভবিষ্যৎদৃষ্টি সত্য হয়েছে কিনা, তাঁর সাধনা সিদ্ধ হয়েছে কিনা দেশ তার পরিচয় পেয়েছে।

সরলাদেবী চৌধুরাণী ছিলেন মনে প্রাণে স্বদেশী। যার পরিচয় আমরা পাই কর্ণ-ওয়ালিস স্ট্রিটের উপর তাঁর 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' স্থাপনার মধ্য দিয়ে। এক সময় তিনি বুঝতে পারেন আমরা যে সমস্ত জিনিস ব্যবহার করছি তার বেশির ভাগটাই বিদেশি। আর সেই কারণেই তিনি নিজের খরচে এই 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' স্থাপন করেন। এটি হল বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে সংগ্রহ করা শুধু মেয়েদের জন্যে একটি স্বদেশী বস্ত্রের ও দ্রব্যের ভান্ডার। সেখানে একজন বিধবা ব্রাহ্ম মেয়েকে মাইনে দিয়ে বিক্রেতা হিসাবে নিযুক্ত করেন তিনি। পরবর্তীকালে অনেকে মিলে যোগেশচন্দ্র রায়ের পরিচালনায় বৌবাজারে 'স্বদেশী স্টোরস' নামে একটি দোকান খোলেন। তাঁদের এই স্বদেশী প্রচেষ্টা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বহু পূর্বেই ঘটে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সেই সময় বম্বেতে অনুষ্ঠিত এক স্বদেশী একজিবিশনে 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' থেকে বিভিন্ন জিনিস পাঠানোর দরুণ তিনি একটি মেডেল পান। এই ঘটনার প্রায় পনের বছর পরে মেডেলটি দেখে মহাত্মা গান্ধী তাঁকে চিনতে পারেন। অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারি মহাত্মা গান্ধীর ভারতে আসার অনেক আগেই তিনি দেশবাসীকে স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এমনকি বসন্তোৎসবে চায়ে নিমন্ত্রণ করে, সেই সঙ্গে পোশাকে বাসন্তী রঙ রাখার নির্দেশ দিয়ে, কিংবা পৌষপার্বণ, নবান্ন ইত্যাদির সম্মিলিত আয়োজন করে তাঁর স্বদেশের প্রতি গভীর ভালোবাসারই পরিচয় ফুটে ওঠে।

সরলাদেবী চৌধুরাণী ছিলেন স্বাধীনতা পিপাসু। পরাধীনতার জ্বালা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেন। সেই সঙ্গে তিনি এটিও বুঝতে পারেন স্বাধীনতা পাওয়াটা এত সহজ নয়। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন–

> "যে জাতির ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষিকার্য বিদেশী- কৃত আইনের শাসনের দ্বারাই বিদেশীর হস্তগত সে জাতি কোনক্রমেই স্বাধীনতার গৌরবে গৌরবান্বিত হতে পারে না। যে জাতি জাতি হিসাবে hewers of wood and drawers of water থাকতে চিরবাধ্য হবে, যে জাতিকে শাসনের নামে তার রক্ত অনায়াসে শোষণ করে পরজাতি সমৃদ্ধ হতে থাকবে, যে জাতির কৃষকরা সোনার ফসল উৎপাদন করেও দুবেলা দুমুঠো অন্ন পাবে না নিজের পেট ভরাতে বা স্ত্রী ছেলের মুখে তুলতে; ক্ষেতে বীজ বপন করতে না করতে বিদেশীর দাদন এসে তাদের যা কিছু সব পরের করে দেবে- সে জাতির স্বাধীনতা সুদূরপরাহত।"[২২]

আর সেই কারণেই তিনি সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দেন। সেই সঙ্গে হাত-পা কোমরসমেত মাথা তুলে দাঁড়াতে বলেন। কেননা তিনি অনুভব করেন আমরা যারা আরামে আয়াসে মানুষ তাদের কাছে স্বাধীনতার আশঙ্কা একটা ভাবের বিলাসমাত্র। উৎপীড়ক লুণ্ঠনকারী ব্রিটিশরা অস্ত্রশস্ত্রে বলীয়ান। প্রথমত, তাদের নিজেদের বন্দুক ও কামান দ্বিতীয়ত ইংল্যাণ্ডের প্রজারই হিতকল্পে ও ভারতীয় প্রজার ক্ষতিকল্পে তারা তৈরী করেছে গভর্নমেন্টের আইন-কানুন। সরলা দেবী বিশ্বাস করতেন যতদিন না এই দুটোর উপর আমাদের দখল আসবে ততদিন আমরা 'নিজ বাসভূমে পরবাসী'। এমন বলিষ্ঠ ও গরিষ্ঠ চূড়ান্ত বক্তব্য কোন মহিলার সেকালে ছিল কিনা সন্দেহ। তাঁর এইসব চিন্তাধারা কেবল সেকালের নয়, সর্বকালের পক্ষেও যে প্রাসঙ্গিক তা আজ প্রায় সর্বজনগ্রাহ্য। এখানেই তিনি থেমে থাকেননি। দেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি বিভিন্ন আন্দোলনেও যোগ দেন। তিনি মনপ্রাণ দিয়ে অসহযোগ আন্দোলন, 'ভারত উদ্ধার দল' প্রভৃতিতে যোগদান করেন। চরকা-খদ্দরের প্রবর্তনে তিনি মহাত্মা গান্ধীর দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। অসহযোগ প্রচেষ্টার প্রথম দিকে তিনি গান্ধীজির একান্তই সমর্থক হন।

অতত্রব আমরা বুঝতে পারি, দেশকে ভিতর থেকে গড়ে তোলার প্রয়াসে, রাষ্ট্রের বিভিন্ন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার আগ্রহে, জাতীয়তাবোধের জাগরণে, স্বদেশচেতনা বৃদ্ধিতে, স্বাধীনতার স্বপ্নকে বাস্তবায়নের চেষ্টায়, রাষ্ট্রীয় সমস্যা ভাবনা নিয়ে কলম ধরতে সরলাদেবী চৌধুরাণী ছিলেন অনন্য।

তথ্যসূত্র :

১. দেবী, স্বর্ণকুমারী, রমণীর স্বদেশব্রত, ভারতী, পৌষ, ১৩১২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৫
২. চৌধুরাণী, সরলাদেবী, জীবনের ঝরাপাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩,

চতুর্থ সংস্করণ, বৈশাখ, ১৪২৩, পৃ. ৩৫-৩৬

৩. তদেব, পৃ. ৫৩
৪. তদেব, পৃ. ৫৩
৫. তদেব, পৃ. ৮২
৬. তদেব, পৃ. ৮৩
৭. তদেব, পৃ. ১৪৯
৮. তদেব, পৃ. ১২৫
৯. তদেব, পৃ. ১১৯
১০. তদেব, পৃ. ১২০
১১. তদেব, পৃ. ১২০
১২. তদেব, পৃ. ১৩০
১৩. তদেব, পৃ. ১৩১
১৪. তদেব, পৃ. ১৩৩-১৩৪
১৫. তদেব, পৃ. ১৩৪
১৬. তদেব, পৃ. ১২২
১৭. তদেব, পৃ. ১২২
১৮. তদেব, পৃ. ১২৩
১৯. দেব, চিত্রা, ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, অষ্টম মুদ্রণ, ২০১৬, পৃ. ৪৮
২০. চৌধুরাণী, সরলাদেবী, জীবনের ঝরাপাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, চতুর্থ সংস্করণ, বৈশাখ, ১৪২৩, পৃ. ১২৩
২১. তদেব, পৃ. ১২৫
২২. তদেব, পৃ. ১৪৪

গ্রন্থপঞ্জি :

আকর গ্রন্থ :

১. সরলাদেবী চৌধুরাণী, জীবনের ঝরাপাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, চতুর্থ সংস্করণ, বৈশাখ, ১৪২৩

সহায়ক গ্রন্থ :

১. অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), কৈলাসবাসিনী দেবী রচনা সংগ্রহ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০০০৬, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৯
২. অভিজিৎ সেন ও অভিজিৎ ভট্টাচার্য (সম্পা.), সেকেলে কথা: শতক সূচনায় মেয়েদের স্মৃতিকথা, নয়া উদ্যোগ, ২০৬ বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭
৩. আনিসুজ্জামান, বাঙালি নারী : সাহিত্য ও সমাজে, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০০
৪. আনিসুজ্জামান ও অন্যান্য, বাংলার স্বদেশী জাগরণ, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা, ২০০৮
৫. আশুতোষ রায়, বাংলা আত্মচরিত সাহিত্যের ধারা, অরুণা প্রকাশন, ২ কালিদাস সিংহ লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, ১৪১৪
৬. ঈশিতা চক্রবর্তী ও অন্যান্য, নৈঃশব্দ ভেঙে: আত্মকথনে ভারতীয় নারী, খোঁজ এখন পরিষদ, ৩৫ ইউ,

রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৫, অক্টোবর, ২০০৫

৭. কমলা দাশগুপ্ত, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী, জয়শ্রী প্রকাশন, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৯৬

৮. কৃষ্ণকলি বিশ্বাস, স্বাধীনতা সংগ্রামের মঞ্চে ভারতের নারী, ফার্মা কে এল এম প্রাঃ লিঃ, ২৫৭-বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০১২, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৭

৯. গোলাম মুরশিদ, নারী প্রগতি : আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী, নয়া উদ্যোগ, ২০৬ বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬, প্রথম ভারতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী, ২০০১

১০. চিত্ররেখা গুপ্ত, প্রথম আলোর চরণধ্বনি, উর্বী প্রকাশন, কলকাতা,২০০৯

১১. চিত্রা দেব, অন্তঃপুরের আত্মকথা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, নবম মুদ্রণ, ২০১৭

১২. চিত্রা দেব, ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, অষ্টম মুদ্রণ, ২০১৬

১৩. দেবীপদ ভট্টাচার্য, বাংলা চরিত সাহিত্য, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, ১৯৮২

১৪. দূর্বা দেব, আত্মজীবনীর স্থাপত্য, ভারতী বুক এজেন্সি, ৬৬/৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৯, ২০০০

১৫. শঙ্করপ্রসাদ চক্রবর্তী (সম্পা.), সরলাদেবী চৌধুরাণী রচনা সংকলন, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৭৩, জানুয়ারী, ২০১১

১৬. সোমেন্দ্রনাথ বসু, বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনী, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতা, ১৯৯৩

১৭. স্বপন বসু, বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ, ২০১৬

১৮. স্বপন বসু, উনিশ শতকে স্ত্রী শিক্ষা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ২০১৯

১৯. সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, অন্দরে অন্তরে : উনিশ শতকে বাঙালি ভদ্রমহিলা, স্ত্রী, কলকাতা-৭০০০২৬, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫

পত্রিকা :

১. অমৃতলোক ৮০, ক্রোড়পত্র : নারীবিশ্ব, ২২ বছর ২য় সংখ্যা, অক্টোবর, ১৯৯৭

২. আকাদেমি পত্রিকা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, অষ্টম সংখ্যা, আষাঢ়, ১৪০২

৩. কোরক সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা সংখ্যা, বইমেলা, ২০১৪

৪. ভারতী, চৈত্র, ১৩১৭